ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর

খোয়াই বিভাগ

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

শিক্ষা অধিকার
ত্রিপুরা
১৯৭২

ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর

খোয়াই বিভাগ

সূচী-পত্র

সম্পাদকের নিবেদন

ত্রিপুরার সামাজিক তথা অর্থনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান হিসাবে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগীয় বিবরণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত অনুসারে শিক্ষা অধিকারের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে ধর্মনগর বিভাগের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে খোয়াই বিভাগের বিবরণ প্রকাশ করা হ'ল। এই বিবরণের পাণ্ডুলিপি রচিত হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। মোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে খোয়াই বিভাগ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্যাদি সঙ্কলিত হয়েছে। যেমন প্রথম অধ্যায়ে খোয়াই অঞ্চলে প্রথমে উপ-বিভাগ ও পরে বিভাগ স্থাপনের কথা, প্রাচীন 'ক্ষমা' নদীর 'খোয়াই' নামকরণ ও সেই সূত্রে ঐ অঞ্চলেরও নামকরণ, কল্যাণপুরে ত্রিপুরার প্রাচীন শাসন-কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ, স্থানীয় বড় বড় ছড়ার গতিপথের বর্ণনা এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বিভাগের নানা স্থানে খনিজ দ্রব্যের সন্ধান প্রাপ্তির বিবরণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে আঞ্চলিক ইতিহাসের উল্লেখ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন, শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অধীন তরপ পরগণার অধিকাংশ স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মহারাজা বিজয়মাণিক্য ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট দখল করেন। তারপর ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা অমরমাণিক্য পুনরায় শ্রীহট্ট অধিকার করেন। সুতরাং বুঝা যায় যে, ইতিমধ্যে কোনও এক সময়ে শ্রীহট্ট ত্রিপুরার রাজাদের হাতছাড়া হয়েছিল। ত্রিপুরায় মোগল প্রাধান্য বিস্তারের কথা প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ১৩১৩ বাংলা সনের 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। ঐ প্রবন্ধে লেখা হয় যে, যশোধরমাণিক্য ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সৈন্য কর্তৃক পরাভূত হন। কিন্তু আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখ কয়েকজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের মতে বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খান ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে যশোধরমাণিক্যকে পরাজিত করে উদয়পুর অধিকার করেন। রামগঙ্গামাণিক্যের সিংহাসন অধিকার প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র লিখেছেন, ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজধর মাণিক্যের (দ্বিতীয়) পরলোক গমনের পর সিংহাসন নিয়ে বড়ঠাকুর রামগঙ্গা ও যুবরাজ দুর্গামণি ঠাকুরের মধ্যে দারুণ কলহের সূত্রপাত হয়। এর পর রামগঙ্গা রামগঙ্গামাণিক্য নাম গ্রহণ করে সিংহাসন দখল করেন। রামগঙ্গামাণিক্যের ১৭২৮ শকাব্দের অর্থাৎ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা পাওয়া গেছে। সিংহাসন অধিকার নিয়ে দুর্গামণির সঙ্গে তীব্র কলহই তাঁর মুদ্রা প্রচারে বিলম্ব ঘটার অন্যতম কারণ হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়ে স্থানীয় অধিবাসীদের কথা প্রসঙ্গে লেখক খোয়াই বিভাগে প্রাচীন বসতিযুক্ত গ্রাম বা মৌজা ছিল না বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। মহকুমা স্থাপনের অনেক আগে থেকেই এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে পার্বত্য প্রজাদের বসতি ছিল। এই সব পার্বত্য বসতি বা হাঁকরের 'বেড়ী', 'ঢোলনা' প্রভৃতি পার্বত্য নামকরণ লক্ষ্যণীয়। সাধারণভাবে খোয়াই বিভাগে পুরান ত্রিপুরা শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য, উজান অঞ্চলে রিয়াং ও নোয়াতিয়া শ্রেণীর অবস্থান, চা-বাগানের কাজে মণিপুরী ও ওরাও, গোড়, মুণ্ডা প্রভৃতি শ্রেণীর শ্রমিকদের ক্রমশঃ সংখ্যাবৃদ্ধি অধিবাসীদের শ্রেণী-বৈচিত্র্যের কারণ হয়ে উঠে বলে জানা যায়। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র কয়েকটি মৌজায় ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই পার্বত্য প্রজাদের জুম চাষ ছেড়ে হাল চাষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন তাও খুবই মূল্যবান। এছাড়া পরিশিষ্টে প্রদত্ত বিভিন্ন মৌজার নাম, জমির পরিমাণ, রাজস্ব দাবী প্রভৃতি তথ্যাদি থেকে এই বিভাগ সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

খোয়াই বিভাগ

প্রথম অধ্যায়

প্রাকৃতিক অবস্থা

স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন কার্যের সুবিধার নিমিত্ত যখন সমস্ত রাজ্যকে উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য বিভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতির অনুকরণে এই রাজ্যেও কার্য পরিচালনের ব্যবস্থা হইতেছিল তখন খোয়াই অঞ্চল সদর বা মধ্য বিভাগের অন্তর্গত ছিল। খোয়াই নদীর নাম হইতেই এই বিভাগের নামকরণ হইয়াছে।[1] এই নদীর তীরেই শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ সব ডিভিশন প্রতিষ্ঠিত। মুচিকান্দি, রাজাবাজার, তুঙ্গেশ্বর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অনেক স্থান ইহার তীরে অবস্থিত। স্বর্গীয় ঠাকুর সাহেব ধনঞ্জয় দেববর্মা মহোদয়ের পরিদর্শনের পরে এই অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপনের সঙ্কল্প স্থিরীকৃত হয়। ধর্মনগর বিভাগ ও খোয়াই উপ-বিভাগ প্রায় এক সময়েই (১৩০৫/১৩০৬ ত্রিপুরাব্দে) স্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমান খোয়াই বিভাগের পূর্ব দিকে আঠারমুড়া, পশ্চিম দিকে বড়মড়া, দক্ষিণে সদর (আগরতলা) ও উদয়পুর বিভাগ এবং উত্তরে ব্রিটিশ এলাকা। ইহার বিস্তৃতি ২৫০ বর্গ মাইল অনুমিত হইয়াছে। খোয়াই নদী আঠারমুড়া প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া শ্রীহট্ট জিলার মধ্য দিয়া মেঘনা নদীর দিকে গিয়াছে। খোয়াই টাউন এবং কল্যাণপুর ইহার তীরে অবস্থিত। খোয়াই নদীর বনকর মহাল এবং এই অঞ্চলের কার্পাস ও জমি মহাল পূর্বে কৈলাসহর নিবাসী কেফিল মহাম্মদ চৌধুরী নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট ইজারা বন্দোবস্তাধীন ছিল। ঐ সকল ইজারা মহাল খাস হইলে উক্ত ইজারাদারদের কাছারীর স্থানেই প্রথমতঃ উপ-বিভাগীয় আফিস স্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমান খোয়াই তহশীল কাছারী ও বাল্লার বাজারের সন্নিকটে তৎসময়ের অনেকগুলি পুরাতন ফলবান বৃক্ষ এখনও বর্তমান আছে। কথিত আছে, বাল্লা নামে জনৈক ব্যক্তি খোয়াই নদীর উত্তর তীরবর্তী স্থান আবাদ করিয়া তথায় তাহার বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিল ; তখন চতুর্দিকে অন্যান্য স্থান গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বাল্লা নাম হইতেই শ্রীহট্টের তরপ অঞ্চলে বাল্লার বাজারের প্রসিদ্ধি লাভ হইয়াছিল। ইহা এই অঞ্চলের একটি বিখ্যাত কারবারের স্থান।

খোয়াই নদী বহু পূর্বে ক্ষমা নদী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" গ্রন্থের ৪১০ পৃষ্ঠায় এবিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমান খোয়াই টাউনের ১১।১২ মাইল উজানে কল্যাণপুর নামক পুরাতন রাজধানী বা শাসন-কেন্দ্রের প্রাচীন কীর্তিকলাপ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। বহু পূর্বে এই কল্যাণপুর হইতেই এতদঞ্চল শাসিত হইত এবং তৎসময়ে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা যে পশ্চিম ও উত্তর দিকে

---

১ খোয়াই বিভাগে ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের কার্যকাল ছিল ১৩১৯ ত্রিং (১৯০৯ খ্রীঃ) ফাল্গুন মাস থেকে ১৩২১ ত্রিং আষাঢ় মাস পর্যন্ত।

বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা স্থানীয় অবস্থা পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইতে পারে। হস্তলিখিত প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থে আছে ;—

"পনর শ দুই শকে ভাদ্র যে মাসেতে।
শ্রীযুত কল্যাণমাণিক্য জন্মিল কৈলাতে॥
অমরমাণিক্য রাজ্য দুই রাজার জন্ম।
যশোমাণিক্য আর কল্যাণমাণিক্য সম্য॥
যশোমাণিক্যের অষ্ট মাসের অন্তর।
জন্মিলেন কল্যাণমাণিক্য নৃপবর॥
জন্মপত্র লিখিছে তান শুন সর্ব্বজন।
অপূর্ব্ব সময় সব্ব অপূর্ব্ব কথন॥"

অন্যত্র ;—

"জন্ম হৈল কৈলাগড়ে মাতামহ গৃহে।
রণবল্লভনারায়ণ মাতামহ হয়ে॥
* * *
শ্রীশ্রীযুত কল্যাণমাণিক্য নরপতি।
উদয়পুরেতে রাজা হৈল মহামতি॥
* * *
পনর শ পাঁচচল্লিশ শকেতে রাজা হৈল।
শুভ দিনে মহারাজা মোহর মারিল॥
শিবলিঙ্গ লিখিলেক মোহর মধ্যেতে।
অবিরভ শিব বিষ্ণু ভাবন্ত মনেতে॥"
* * *

শ্লোকঃ

"রাজা ভবদ্বিষ্ণুপরায়ণো
বৈ শরদ্ধিমাংশোঃ কুলসম্ভবশ্চ।
অভেদধর্ম্মঃ কিল কল্পবৃক্ষঃ।
কল্যাণমাণিক্য মহীমহেন্দ্রঃ॥"

বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত রাজমালা গ্রন্থেও কল্যাণপুর এবং সন্নিকটবর্তী বর্তমান ব্রিটিশ এলাকান্তর্গত বালিশিরা বিশগাঁও প্রভৃতি জমিদারী সম্পর্কিত অনেক বিবরণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বড়মুড়া এবং আঠারমুড়া নামক উচ্চ পর্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া খোয়াই নদী প্রবাহিত। এই উভয় দিকের পর্বত হইতে বহু ছোট-বড় ছড়া আসিয়া খোয়াই নদীতে মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মছড়া, সর্বংছড়া, লালছড়া প্রভৃতি বড় বড় ছড়ার উভয় পার্শ্বে আবাদযোগ্য সমতল স্থানও অনেক আছে। খোয়াই নদী ভিন্ন বর্তমান খোয়াই বিভাগে অন্য কোন বড় নদী নাই।

এই নদীপথে ব্রহ্মছড়ার সন্ধিস্থল পর্যন্ত বৎসরের সকল সময়েই ছোট নৌকায় যাতায়াত করা যায়। বর্ষার সময় অন্যান্য পার্বত্য নদীর ন্যায় ইহার স্রোতোবেগ ও জলপ্লাবন অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিয়া থাকে। পূর্বোক্ত বড়মুড়া ও আঠারমুড়ার যে সকল ছড়া বা জলপ্রপাত খোয়াই নদীতে মিলিত হইয়াছে তৎ সমস্তই খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত; অপর দিকের ছড়াগুলি পার্শ্ববর্তী কৈলাসহর ও সদর বিভাগের অন্তর্গত। খোয়াই বিভাগের উত্তর প্রান্তে উদনা ও কালেঙ্গা নামে দুইটি ছড়া আশারাম-বাড়ী তহশীল এলাকা দিয়া প্রবাহিত। বনগ্রাম নামক স্থানে এই উভয় ছড়া একত্র মিলিত হইয়াছে। রেমাছড়া নামক একটি ছড়ার পার্শ্বেই রেমা চা-বাগান অবস্থিত। এই সমস্ত স্থানই খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কতিপয় কর্মচারীর অন্যায় কার্য দ্বারা তাহা ব্রিটিশ সামিলে দখল হওয়ায় একটি বড় মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। মহামান্য প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে যে শেষ নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাতে অনেক স্থান স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১৩২০ ত্রিং সনে স্টেট জিওলজিষ্ট মিঃ অশোক বসু খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধানে খোয়াই বিভাগে আসিয়া খোয়াই নদীপথে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়াছিলেন এবং এই বিভাগের অনেক স্থানেরই রীতিমত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। মৃত্তিকার স্তর পরীক্ষার পক্ষে নদী ও ছড়াগুলিই বিশেষ উপযোগী। খোয়াই বিভাগের স্থানে স্থানে লৌহ, কয়লা, চুনা পাথর, কেওলিন মাটি প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। মিঃ বসু ঐ সকল খনিজ পদার্থের নমুনা সহ বিস্তারিত রিপোর্ট যথাসময়ে রাজধানীতে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন। মিঃ বসু সর্বদাই বলিতেন, এ রাজ্যে কৃষি, ফলের বাগান ও বনজ দ্রব্যাদির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে পারে এবং এই সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষ উপযুক্তরূপ যত্নবিধান করিতেছেন না বলিয়া তিনি অনেক সময় আক্ষেপ করিতেন বলিয়া শুনা যায়।

খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুরের চতুর্দিকস্থ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান শিকারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে বন্য হস্তী, ব্যাঘ্র, হরিণ, শূকর প্রভৃতি জন্তু যথেষ্ট পাওয়া যাইত। মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য বাহাদুর সিংহাসনারোহণ করার পরই একবার এবং ১৩২০ ত্রিং সনের শেষ ভাগে রাজধানী আগরতলা হইতে বীরেন্দ্রনগরের পথে কল্যাণপুরে দ্বিতীয়বার শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। পলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপটেন মারে, শিক্ষক মিঃ উইলিয়ম প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও দ্বিতীয়বার মহারাজার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। মহারাজা মাণিক্যবাহাদুরের ব্রিটিশবাসী ও সাধারণ রাজ্যবাসী প্রধান প্রধান প্রজাগণ তৎসময়ে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়াও নিজ নিজ বহুসংখ্যক হস্তী দ্বারা মহারাজা বাহাদুরের সহায়তা করিয়া সন্তোষভাজন হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে খোয়াই বিভাগে ব্যাঘ্র ও বন্য হস্তীর উপদ্রবে প্রজাগণ অতিশয় উপদ্রুত হইতেছিল। শিকারীদিগের উৎসাহ বর্ধনের জন্য কয়েকবার সরকার হইতে বিশেষ পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণাও করা হইয়াছিল। ব্যাঘ্র ও বন্য হস্তী দ্বারা কয়েকটি লোক মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে পরেই এই প্রকার উৎপাত হইতে দেখা গিয়াছে। কল্যাণপুরের আবাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধুনা বন্য জন্তুর উৎপাতও কমিয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাস

মহারাজা কল্যাণমাণিক্যের সময়ে এবং তৎপূর্বে কল্যাণপুর ও খোয়াই অঞ্চলের অবস্থা যে বিশেষ উন্নত ছিল প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি দেখিয়া তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত হবিগঞ্জ সব-ডিভিশনের অধীন তরপ পরগণার অধিকাংশ যে স্বাধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত তৎসম্বন্ধেও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উদয়পুর বিভাগান্তর্গত অমরসাগর দীঘি খনন করার উপলক্ষে তরপ পরগণা হইতে দাঁড়ি বা মাটিয়াল না দেওয়ায় যে ভাবে শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে হস্তলিখিত রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে ;

"সপ্তহাজার একশত দাঁড়ির নিবাস।
কবিচন্দ্র পুত্রে কহে সুবুদ্ধি বিশ্বাস ॥
কেহ ভয়ে কেহ প্রীতে কেহ মান্যে দিল।
বাব পাঙ্গালায় দিছে তরপ না দিল ॥
একথা শুনিয়া রাজা বড় ক্রোধ হৈল।
রাজ্যের নিকট রাজ্য আমা গ্লানি কৈল ॥
রাজধর রাজপুত্র যুদ্ধে নিয়োজিল।
বাইশ সহস্র সেনা তার সঙ্গে দিল ॥
জিকুয়া গ্রামেতে সৈন্য কোট বান্ধি রৈল।
মুহেল লসকর সিদ্ধিরাম তাতে ধরা গেল।
পিতাপুত্র দুইজন পিঞ্জরে ভরিয়া।
উদয়পুরে লৈয়া গেল ত্বরিত করিয়া ॥"

১৩১৩ বাং সনের ভারতী পত্রিকার ৯২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে অমরমাণিক্যের পৌত্র ত্রিপুরাধিপতি যশোধরমাণিক্য দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের মোগল সৈন্য কর্তৃক পরাভূত হন।[১] তৎপূর্বে এতদঞ্চলে মোগলের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল না বলা যাইতে পারে। মোগলাধিকারের পর হইতে স্বাধীন ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী স্থানগুলি 'মোগলান' বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। তৎপর খোয়াই বিভাগের পার্শ্ববর্তী তরপ পরগণা ইংরেজ শাসনাধীনে শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত হইয়াছে। বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালা গ্রন্থ পাঠে জানা যায় মহারাজা রামগঙ্গামাণিক্যের আদেশ অনুসারে তদীয় বিশ্বস্ত কর্মচারী রামহরি বিশ্বাসের নামে বালিশিরা বিশগাঁও প্রভৃতি পরগণার অন্তর্গত বিস্তীর্ণ জমিদারী ত্রিপুর রাজসরকার খরিদ করেন। তৎসময়ে এই রাজপরিবারের গৃহ-বিবাদ বশতঃই এই মূল্যবান সম্পত্তি বিনামিতে খরিদ করিতে হইয়াছিল। ১২১৪ ত্রিপুরাব্দে (১৮০৪ খ্রীঃ) মহারাজা রাজধরমাণিক্য মানবলীলা সম্বরণ করেন।[২] মহারাজার মৃত্যুর পর সিংহাসনের

১ ঐতিহাসিকদের মতে যশোধরমাণিক্য ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ কর্তৃক পরাভূত হন।
২ দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য।

অধিকার লইয়া ভীষণ কলহ উপস্থিত হয়। অতঃপর কুমার রামগঙ্গা মহারাজা রামগঙ্গামাণিক্য নাম গ্রহণপূর্বক পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১] রাজধরমাণিক্য ও দুর্গামাণিক্য সম্পর্কিত মোকদ্দমার বিবরণ ১২৮৯ বাঙ্গালা সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত সাময়িক সমালোচনা ও মীমাংসা গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। তৎসময়ে রাজ পরিবারের গৃহবিবাদ এবং রাজ্যে কুকীর উপদ্রব ইত্যাদির দরুন এতদঞ্চলে শাসন সংরক্ষণের সুব্যবস্থা ছিল না। মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর এবং মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর প্রবর্তিত ব্যবস্থা অনুসারে অধুনা খোয়াই বিভাগের রাজকার্য পরিচালিত হইতেছে।

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ধন্যমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার গগন ফার পুত্র কল্যাণমাণিক্যের রাজ্যপ্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না জানা যায়। তিনি 'বাছাল' সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া যেভাবে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন রাজমালা গ্রন্থে তদ্বিবরণ বর্ণিত আছে। প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা কল্যাণমাণিক্য খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

বর্তমান খোয়াই বিভাগ সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রাচীন কীর্তিসমূহের উল্লেখ করা যাইতে পারে,

(১) কল্যাণসাগর :—ইহা উচ্চপাড় বিশিষ্ট একটি সুবৃহৎ জলাশয়। জঙ্গল ও বড় বড় বৃক্ষাদিতে বর্তমান সময় এই প্রাচীন কীর্তি আবৃত অবস্থায় আছে। ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে অনেকগুলি বড় ও ছোট পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩১৯ ত্রিং সনে কল্যাণসাগরের পাড়ে ও উত্তর দিকের সমতল স্থানে কমলসিং প্রভৃতি মণিপুরীদের বাসস্থান ছিল। কায়েমী তালুক ও জোত বন্দোবস্ত দ্বারা শীঘ্রই এই সকল স্থানের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্তী নামীয় কায়েমী তালুক ইহার সন্নিকটেই অবস্থিত। ১৩২০ ত্রিং সনে মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য বাহাদুর শিকার উপলক্ষে আসিয়া কল্যাণসাগরের সংস্কার সাধনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(২) কালীমন্দির—কল্যাণসাগরের পূর্ব-উত্তর কোণের সন্নিকটে এই প্রাচীন কীর্তি—ইষ্টক নির্মিত মন্দির অবস্থিত। ইহার গঠন ও আকৃতি উদয়পুরস্থিত মন্দিরগুলির অনুরূপ। মন্দির-গাত্রে শিলালিপি সংযুক্ত ছিল কিন্তু এখন তাঁহাতে কোন শিলালিপি নাই। মন্দিরের অভ্যন্তরে উই পোকার মৃত্তিকাস্তূপে বেদী পর্যন্ত দৃষ্টির অগোচর হইয়াছে। ১৩২০ ত্রিং সনে দেখা গিয়াছিল মন্দিরটি সংস্কারের অযোগ্য হয় নাই। স্থানীয় মণিপুরিগণ ইহাকে কালীমন্দির বলিয়াই জানাইয়াছে। তদ্ভিন্ন নির্ভরযোগ্য অন্য কোন প্রমাণ এই কীর্তি সম্পর্কে পাওয়া যায় নাই। পূব কথিত কমলসিং মণিপুরী প্রভৃতি প্রজাদের নিকট শোনা গিয়াছে যে গুপ্তধনের অনুসন্ধানে একটি লোক মন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত উইয়ের ঢিপি খননের প্রয়াস করিয়াছিল কিন্তু রাত্রে বিভীষিকা দেখিয়া ঐ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর আর কেহ সেরূপ প্রয়াস করে নাই। ইহা কালীমন্দির বলিয়াই স্থানীয় প্রজাগণ লোকপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছে।

(৩) প্রাচীন সড়ক—কল্যাণসাগরের পাড় ও পূর্ব কথিত কালীমন্দির হইতে চতুর্দিকেই কতকগুলি পুরাতন সড়কের চিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। সড়কগুলি প্রশস্ত ও উচ্চ; যতই জঙ্গল পরিষ্কৃত হইতেছে ততই ঐগুলির বাহুল্য ও বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হইতেছে। খোয়াই নদীর

১ রামগঙ্গামাণিক্যের ১৭২৮ শকাব্দের মুদ্রা পাওয়া গেছে।

পশ্চিম পাড় দিয়া আসামপাড়া হইতে কল্যাণপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। পুরাতন সড়ক অবলম্বনে একটি নূতন সড়ক নির্মাণের প্ল্যান ও এষ্টিমেট ১৩২০ ত্রিং সনে বিভাগীয় আফিস হইতে দাখিল করা হইয়াছিল।

(৪) পুরাতন বাজার—পূর্ব কথিত কল্যাণসাগরের অনতিদূরেই খোয়াই নদী প্রবাহিত। সর্বংছড়া যেস্থানে খোয়াই নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে তন্নিকটবর্তী একটি সমতল স্থানকে স্থানীয় লোকে পুরাতন বাজার ও হাটের স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। ছনবাতাপূর্ণ এই সমতল স্থান হরিণ প্রভৃতি বন্য জন্তুর আবাস স্থানে পরিণত হইয়াছে। ১৩২০ ত্রিং সনে কল্যাণপুর তহশীল কাছারীর সন্নিকটে যে হাট ও বাজার স্থাপিত হইয়াছে তাহাই কিছুকাল পরে পুরাতন বাজারের স্থানে স্থানান্তরিত করারও প্রস্তাব ছিল।

(৫) বিবির দরগা—পূর্বোক্ত বিস্তীর্ণ সমতল স্থানের এক প্রান্তে একটি স্থানে কয়েকটি বড় বড় বৃক্ষ দণ্ডায়মান আছে। এই স্থানে মুসলমান বন কামলাগণ আসিয়া সময় সময় চেরাগ বা প্রদীপ দিয়া ইহাকে 'বিবির দরগা' নামে পরিচিত করিয়াছে জানা গেল। এই স্থানে ইষ্টক নির্মিত কোন প্রাচীন চিহ্ন দেখা যায় নাই। এই নামের উৎপত্তিরও কোন কারণ জানা যায় নাই।

(৬) বার আউয়ালিয়া টীলা—এই গভীর জঙ্গলাকীর্ণ একটি স্থান বহুকাল হইতে পরিচিত হইয়েছে। ফকির-দরবেশদিগের দ্বারা এই স্থান সমাদৃত বলিয়া ব্রিটিশবাসী মুসলমান ও বন কামলাদিগের নিকট জানা গিয়াছে। পূর্বোক্ত বিবির দরগার ন্যায় এই স্থানেরও বিশেষ কোন বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই। এইস্থানে ব্যাঘ্র ভীতি আছে।

(৭) রাজার দীঘি—ইহা খোয়াই টাউন ও আসামপাড়া তহশীল কাছারীর মধ্যবর্তী স্থানে সড়কের পার্শ্বে ব্রিটিশ এলাকায় অবস্থিত। উচ্চপাড় বিশিষ্ট এই পুরাতন দীঘির জল উৎকৃষ্ট এবং পানীয়-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আসাম-বেঙ্গল রেলরাস্তার সায়েস্তাগঞ্জ ষ্টেশন হইতে খোয়াই টাউন পর্যন্ত ১৮।২০ মাইল সড়কের উভয় পার্শ্বেই অনেক পুরাতন দীঘি-পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত রেলরাস্তা স্থানে স্থানে "রাজার জাঙ্গাল" নামক প্রাচীন জাঙ্গাল অতিক্রম করিয়াছে। গোচাপাড়া মৌজার বিশ্বাস বংশীয়গণের বিস্তর ভূসম্পত্তি পূর্বে তরপ পরগণায় ছিল। ইষ্টকালয় সমন্বিত ভদ্রাসনবাড়ী দ্বারাও তাহাদের পূর্ব গৌরব সূচিত হইতেছে। ইহাদের বিশ্বাস উপাধি ত্রিপুররাজসরকার প্রদত্ত বলিয়াও জানা যায়। ত্রিপুররাজসরকারের লাহারপুর গং জমিদারীর অন্তর্গত রাজার বাজার নামক স্থানে দীর্ঘকাল যাবৎ একটি তহশীল কাছারী স্থাপিত আছে। তরপ পরগণার ইতিহাসের সহিত বর্তমান খোয়াই বিভাগ ও কল্যাণপুরের ইতিহাসের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। এস্থলে তৎসম্পর্কে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয় অধ্যায়

অধিবাসী

বর্তমান খোয়াই বিভাগে প্রাচীন বসতিযুক্ত কোন মৌজা বা গ্রাম নাই। পার্বত্য প্রজাগণ কোনও এক স্থানে স্থায়ীরূপে বাস করে না। জুম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বাসস্থানেরও পরিবর্তন হইয়া থাকে। সব-ডিভিসন স্থাপিত হওয়ার বহু পূর্ব হইতেই প্রাচীন প্রথানুসারে এই সকল স্থানের পার্বত্য প্রজার বসতিগুলি কতিপয় 'হাঁকরে'* বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় বিভক্ত ছিল, যথা ঢোলনা হাঁকর, বেড়ী হাঁকর ইত্যাদি। এই অঞ্চলে পুরান ত্রিপুরা শ্রেণীর প্রজার সংখ্যাই অধিক; ইহাদের অনেকেই রাজধানী আগরতলার সহিত রাজসেবাদি সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। প্রাচীন রাজমালায় পুরান ত্রিপুরাগণ 'বাছাল' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং কার্যবিভাগ অনুসারে ইহারা বিভিন্ন 'হদা' বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ঘালিম ও সেবক শ্রেণীর অনেকে সেনাপতি, কবরা প্রভৃতি উপাধিলাভে সম্মানিত হইয়া থাকে। পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে এই সকল উপাধিধারী ব্যক্তিগণের প্রাধান্যও যথেষ্ট আছে। ইহারাই প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সামাজিক বিচারে সমাজ সংহতি রক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। অনেক সময়েই বর্তমান পুলিশ ও তহশীল সম্পর্কিত রাজকর্মচারী অপেক্ষা পূর্ব প্রথানুযায়ী উপাধিবিশিষ্ট ঐ সকল লোক দ্বারা দেশের ও দশের বহু উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

১৩২০ ত্রিপুরাব্দে যে আদম সুমারী হইয়াছে তৎসম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিবরণী যথা সময়ে প্রচারিত হইয়াছে। রিয়াং ও নোয়াতিয়া শ্রেণীর পার্বত্য প্রজা উজান অঞ্চলে বাস করে; মণিপুরী ও কুলি প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু ইহারা কোনও এক স্থানে স্থায়ীভাবে দীর্ঘকাল বাস করিতে অভ্যস্ত নয়। বর্তমান খোয়াই বিভাগের সীমানার নিকটবর্তী অনেক সমতল ভূমি কুলি প্রজাদের দ্বারা আবাদিত। ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় বা প্রলোভনে যে সকল লোক চা-বাগানে মজুরীর জন্য চালান হইয়া আসে তাহারাই বাগানে পৌঁছিলে কুলি বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। চা-বাগানের কুলির নাম রেজেষ্টিভুক্ত করার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। ১৩২০ ত্রিং সনের সেন্সাস সময়ে খোয়াই বিভাগের এই শ্রেণীর প্রজাগণ 'কুলি' বলিয়া পরিচিত হইতে এবং তাহাদের নাম রেজিষ্টারীভুক্ত করিতে দলবদ্ধভাবে আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিল। তন্মতে তাহাদিগকে কুলি না লিখিয়া স্ব স্ব জন্মগত পদবী অনুসারে ওরাও, গোড়, মুণ্ডা প্রভৃতি লিখিত হইয়াছিল। ১৩২০ ত্রিং সনের পূর্বে খাস মহালের জোত-জমির বন্দোবস্ত বিষয়ে যে নিয়ম চলিতেছিল তদ্বারা জঙ্গলাবাদ ও প্রজার বসত বৃদ্ধির উদ্দেশ্য উপযুক্তরূপে সাধিত হইতেছিল না। কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত কয়েকটি কায়েমী তালুক বন্দোবস্ত হওয়ার পর হইতে চাষ-আবাদ বৃদ্ধি ও স্থানীয় উন্নতি আশানুরূপ হইতেছে। খাস মহালের অন্তর্গত রামচন্দ্রঘাট, আলেপছা, পদ্মবিল, ধলাবিল প্রভৃতি মৌজায় পার্বত্য প্রজাগণ বাঙ্গালীদের ন্যায় চাষ-আবাদ কার্যে মনোযোগী হইয়া ক্রমশ: পার্বত্য জুম প্রথা পরিত্যাগ করিতেছে।

খোয়াই টাউন ও ইহার সন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে মদ্য ও তদানুসঙ্গিক চরিত্রহীনতার প্রভাব লোকসংখ্যার অনুপাত অনুসারে অধিক দৃষ্ট হয়। মেলকাবাড়ী আবকারী দোকানে বৎসরের অধিকাংশ সময় দৈনিক এক মণের অধিক মদ্য বিক্রিত হইতে দেখা গিয়াছে। এই বিভাগে অনেকগুলি আবকারী দোকান আছে এবং ঐ সকলের ইজারা জমা দ্বারা সরকারের যথেষ্ট আয় হইতেছে

বটে কিন্তু নৈতিক হিসাবে আবকরী মহাল দ্বারা প্রজাদের গুরুতর ক্ষতি হইতেছে। ১৩২০ ত্রিং সনে খোয়াই বাজারে (বাল্লার বাজারে) ৫।৬টি বেশ্যা স্থায়ীভাবে থাকিতে দেখা গিয়াছিল। হাটের দিন হবিগঞ্জ, মুচিকান্দি প্রভৃতি স্থান হইতে এই শ্রেণীর আরও অনেক লোক আসিয়া স্থানীয় অধিবাসী-দিগের সর্বনাশ সাধনে নিযুক্ত হইত। এই বিপদ হইতে লোকদিগকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বাবু নবকুমার চক্রবর্তী উকীল প্রমুখ কতিপয় সদাশয় ব্যক্তির সহায়তায় বহুবিধ অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল এবং তৎসময়ে ১৩২০ ত্রিপুরাব্দে খোয়াই টাউনে হরি মন্দির প্রতিষ্ঠা দ্বারা ধর্মভাব পরিপুষ্টির সদুপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। স্থানীয় পাঠশালাটিকে মধ্য ইংরেজী স্কুলে উন্নত করা, সাধারণের পাঠাগার স্থাপন (Public Library), টাউন হল নির্মাণ প্রভৃতি অন্যান্য হিতকর কার্যের সূত্রপাতও তৎসময়ে চলিতেছিল। বনজ দ্রব্যের রপ্তানী করের উপর 'দেবতার বৃত্তি' বলিয়া একটি বৃত্তি স্থাপন করিয়া হরি মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাবু পার্বতীচরণ ধর প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই কার্যের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। স্থানীয় চাঁদা এবং মোকদ্দমাকারীদের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ সাহায্য দ্বারা লাইব্রেরীর কার্য সুচারুরূপেই চলিতেছিল। এই সকল সুব্যবস্থা দ্বারা কিছু কালের মধ্যেই পতিতা নারীদের তিরোভাব এবং নৈতিক ক্রমোন্নতির মুখ দেখা যাইতেছিল। মফঃস্বলের তহশীল কাছারীগুলিতে হরি মন্দির স্থাপনের অনুষ্ঠান চলিতেছিল। ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ইংরেজরাজের পক্ষে ভারতীয় প্রজার ধর্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি সঙ্গত বিবেচিত হইতেছে বটে কিন্তু ত্রিপুরেশ্বরের পক্ষে স্বাধীন ত্রিপুরাবাসিদিগের সম্পর্কে সেরূপ নীতি অবলম্বন করিয়া প্রধান রাজপুরুষদের নিশ্চেষ্টতা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য মনে করা যাইতে পারে না।

খোয়াই বিভাগের প্রজাগণ শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই অনুন্নত। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও নিম্ন শিক্ষা অবৈতনিক কিন্তু যে শ্রেণীর লোক সামান্য বেতনে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহাদের দ্বারা মোটের উপর বিশেষ কিছুই উপকার হইতেছে না। এই শিক্ষা বিতরণ পদ্ধতির উন্নতি বিধান করা কর্তব্য। কিছুকাল পূর্বে খোয়াই বিভাগের প্রকাশচন্দ্র দে নামক জনৈক গুরুমহাশয় পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে নিজেকে চিত্রগুপ্ত বলিয়া প্রচার করতঃ আরও কয়েকটি চতুর লোকের কাহাকেও রাম, কাহাকেও লক্ষ্মণ এবং কেহ কেহ ব্রহ্মাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া সরল বিশ্বাসী পার্বত্য প্রজাদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছিল। পরে ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াও দণ্ড ভোগ করিয়া নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। পুলিশ ইনস্পেক্টার বাবু হেমন্তকুমার মজুমদার এই পণ্ডিত মূর্খকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিয়াছিলেন। বাঙ্গালী-কলঙ্ক প্রকাশচন্দ্র দে একটি ত্রিপুরা যুবতীর পানি গ্রহণ করিয়া আশারামবাড়ী তহশীল এলাকায় বাস করিতেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ স্বাস্থ্য

বর্তমান খোয়াই বিভাগের সর্বত্রই পানীয় ও ব্যবহারোপযোগী জলের নিতান্ত অভাব। পার্বত্য প্রজাগণ নদী ও ছড়ার জল ব্যবহার করিয়া থাকে। নিম্ন ও সমতল ভূমির নদী এবং ছড়ার জল নানাবিধ কারণে দূষিত হইলে স্থানীয় লোকদিকের মধ্যে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি প্রতিষেধযোগ্য ব্যাধির আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট জিলার পার্শ্ববর্তী পার্বত্য প্রদেশের ন্যায় এই বিভাগে জ্বরের প্রাদুর্ভাব অধিক। পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবী ও নদী ছড়ার পূজা দ্বারা এবং এতদুপলক্ষে হাঁস, মুরগী, পাঁঠা, ডিম্ব প্রভৃতি বলি প্রদান দ্বারা স্ব স্ব ধর্ম বিশ্বাস মতে রোগের প্রতিকার করা হইয়া থাকে। অন্যবিধ ঔষধ তাহাবা সাধারণতঃ ব্যবহার করে না। মণিপুরী প্রজাদের মধ্যে মন্ত্রাদি সহ শরীর মর্দন দ্বারা রোগের প্রতিকার করার নিয়ম আছে। অধুনা অনেকেই ডাক্তারী ও কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুচিকিৎসকের অভাবে ইহারা অনন্যোপায় হইয়া অশিক্ষিত হাতুড়িয়া চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে বহু ব্যয়সাধ্য বর্তমান চিকিৎসা পদ্ধতি দ্বারা বিশেষ কিছুই উপকার হইতেছে না। এ জন্য দারিদ্র ও রোগ অনেকেরই নিত্য সহচর দেখিতে পাওয়া যায়। খোয়াই টাউনে একজন সরকারী ডাক্তার ও একটিমাত্র দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। কিছুকাল যাবৎ ডাক্তারের দর্শনী বা ভিজিটের বিশেষ বিধি প্রচলিত হওয়ায় দরিদ্র ও অক্ষম প্রজাদের ক্ষতি ও অধিকতর কষ্টের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষা ভিন্ন এই স্বাস্থ্যহীনতা দূর করার উপায় দেখা যায় না।

খোয়াই বিভাগে উপদংশ এবং কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা লোকসংখ্যার তুলনায় সাধারণতঃ অধিক দৃষ্ট হয়। সন্নিকটবর্তী স্থান সমূহের চা-বাগানের কুলি ও পতিতা স্ত্রীলোক সংসর্গে এবং মদ্যের ব্যবহারাধিক্যবশতঃ এই রোগের বিস্তৃতি হইতেছে। অনেক পার্বত্য পল্লীতেও এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। এজন্য শিশু-মৃত্যুর সংখ্যাও পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে। সামাজিক ও নৈতিক জীবন ক্রমশঃ অধিকতর উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে বলিয়াই ব্যাধি-বিড়ম্বনা প্রজাদের চিরসঙ্গী হইয়া অশান্তি উদ্বেগ বৃদ্ধি করিতেছে।

পুরান ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অঞ্চলে ভেকধারী বৈরাগীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রকারের বৈষ্ণব স্ত্রী-পুরুষের আধিক্য বশতঃ অলসতা এবং দারিদ্র্যের প্রভাব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বীয় সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন বাঙ্গালী বা অন্য সমাজের লোকের নিকট ইহারা ভিক্ষা পায় না। নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, ব্রহ্মপুত্র স্নান প্রভৃতি তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে ইহারা কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজ দূরবর্তী স্থান হইতে আনয়ন করিয়া থাকে। পার্বত্য প্রজাদিগকে উক্ত প্রকারের বৈরাগ্য ও বিলাসিতার প্রভাব হইতে রক্ষা করার উপযুক্ত চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

১৩২০ ত্রিং সনে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের চেষ্টায় সন্নিকটবর্তী ঘনশ্যামপুর বা আমু, সিন্দুরখাল, রাজঘাট প্রভৃতি চা-বাগান সমূহের ইয়োরোপীয় ম্যানেজার সাহেবদের সহিত খোয়াই বিভাগের রাজ কর্মচারীদিগের বিশেষ সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপূর্বে চা-বাগানের কুলি সম্পর্কিত বিষয়ে ইন্দ্র নাগ নামক জনৈক বাবুর গ্রেপ্তার ও শাস্তি বিধান উপলক্ষে অত্যন্ত মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং এতদুপলক্ষে রাজধানীর কর্তৃপক্ষকেও একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল। সরকারী কাগজপত্রাদি আলোচনা করিলে তদ্বিবরণ জানা যাইতে পারে। এই সময়ে রেমা চা-বাগানের ম্যানেজার মিঃ স্প্রুল এবং সিন্দুর-

খাল বাগানের ম্যানেজার সাহেব রাজ-সরকারী কতিপয় রুগ্ন কর্মচারীর চিকিৎসার সাহায্যের জন্য স্বীয় স্বীয় অধীনস্থ ডাক্তারকে ঔষধ সহ পাঠাইয়া উপকার করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন।

খোয়াই বিভাগের ব্রিটিশ সীমানার নিকটবর্তী স্থানের পার্বত্য ও কুলি প্রজার স্বাস্থ্য ও নৈতিক উন্নতির জন্য চা-বাগানের সাহেব ম্যানেজারদিগের অনেকেরই বিশেষ যত্ন থাকিতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে তাহাদের স্বার্থও কতক আছে। কারণ স্বাধীন রাজ্যের প্রজারা 'চুক্তি' নিয়া সময় সময় চা-বাগানের নানারূপ কার্য করিয়া থাকে। স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র উন্নত হইলে এই প্রকারের লোক দ্বারা তাঁহাদের বাগানের কার্য অধিকতর সুসম্পন্ন হইতে পারে।

১৩২০ ত্রিং সনে খোয়াই টাউনে একটি, আশারামবাড়ী তহশীল কাছারীর সন্নিকটে একটি, ও গণকী মৌজায় একটি সরকারী পুষ্করিণী খনন ও পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল। প্রজাদের মধ্যেও যাহাতে পুষ্করিণী খনন কার্যে উৎসাহ বর্ধিত হয় তৎসম্বন্ধে নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। পুষ্করিণীর জমা হ্রাস করা সম্বন্ধে মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুরের বিশেষ আদেশ সারকিউলার দ্বারা প্রচারিত আছে।

পার্বত্য প্রজাদিগের সাধারণ খাদ্য সর্বত্রই প্রায় একরূপ। জুমজাত আতপ তণ্ডুলের সফেন মোটা ভাত, মুলি বাঁশের অঙ্কুর (করুল) সিদ্ধ মাংস, শুকনা মৎস্য, বিশেষতঃ 'বেরমান' (পুঁটি মাছের সিদল) ক্ষার পানি (মুলি বাঁশের অঙ্গার-জাত কয়লার চুয়ান লবণ জল) ও বনজাত নানাবিধ তরকারীই ইহাদের নিত্য আহার্য। এই সকল স্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্বারা স্বভাবসুলভ নিয়মে ও পরিশ্রমের গুণে পার্বত্য প্রজা-দিগের শরীর বেশ ভালই থাকে। নবাগত বাঙ্গালী প্রজাদের মধ্যেই নানাবিধ রোগের আধিক্য দেখা যায়। পানীয় জলের সংস্থান ও জঙ্গলাবাদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ স্বাস্থ্য ক্রমশঃই ভাল হইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আর্থিক অবস্থা

স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের বিস্তৃতি ও ভূমির পরিমাণ ৪,০৮৬ বর্গ মাইল। ১৩২০ ত্রিং সনের সেন্সাস অনুসারে লোকসংখ্যা ২২৯,৬১৩ জন ছিল। এই রাজ্যের আয় ঐ সনে মং ৯,৪০,৫০৬ টাকা হইয়াছিল। সংসৃষ্ট জমিদারীর আয় মং ৯,০৭,২৭৭ টাকা ছিল। খোয়াই বিভাগের বিস্তৃতি ২৫০ বর্গ মাইল ধরা হইয়া থাকে। ১৩২০ ত্রিং সনে খোয়াই বিভাগের নিট আয় ১,১৫,০০০ টাকা হইয়াছিল ; তন্মধ্যে বনকর ও তিল কার্পাসের মাশুল বাবত প্রায় ৮০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। পূর্বে যখন খোয়াই বিভাগের তিল, কার্পাস ও বনকর মহাল কৈলাসহর নিবাসী কৈছির মহাম্মদ চৌধুরীর সহিত ইজারা বন্দোবস্তাধীন ছিল তখন ঐ ইজারার জমা মাত্র মং ৬০০০ (ছয় হাজার) টাকা ছিল। সেই তুলনায় রাজ্যের আয় উত্তরোত্তর কি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহা এতদ্দ্বারা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ১৩২০ ত্রিং সনের পূর্বে আর কখনও খোয়াই বিভাগের নিট আয় এত অধিক হয় নাই।

পূর্বে খোয়াই বিভাগের উৎপন্ন তিল, কার্পাস ও বনজদ্রব্য বিনা মাশুলে রাজ্যান্তরে চলিয়া যাওয়ার অনেক পথ ছিল ; এজন্যই সরকারী আয়ের খর্বতা ঘটিত। ১৩২০ ত্রিং সনে ব্রিটিশ মুচিকান্দি বাজারের পরিবর্তে খোয়াই টাউনেই তিল, কার্পাস খরিদ বিক্রয়ের স্থান নির্দিষ্ট হওয়ায় এবং চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের কতিপয় বিশিষ্ট কোম্পানীর পক্ষে খোয়াই টাউনে ঐ সকল মালের খরিদ্দার

প্রেরিত হওয়ায় ব্যবসায়ীদের ও সরকারী কার্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। তৎসময়ে জলপথে রপ্তানিকৃত মালের উপর স্থানীয় দেবতার রপ্তি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হওয়ায় ঐ সকল মহালের কার্য-কলাপ পরিদর্শনের এবং ব্যবসায়ীদের কার্য পরিচালনের সুব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব সততার সহিত কার্যগুলি চলিতেছিল এবং এজন্য ঐ সকল বিষয়ে আয়ও যথেষ্ট বৃদ্ধি হইতেছিল। খোয়াই, উদনা, কালেঙ্গা প্রভৃতি নদী ও বড় বড় ছড়াগুলি দিয়াই রাজ্যোৎপন্ন বনজ দ্রব্য এবং তিল, কার্পাস ইত্যাদি রাজ্যান্তরে রপ্তানি হইয়া থাকে। খোয়াই অঞ্চলের পার্বত্য প্রজাগণ অবসর সময়ে বাঁশ বেতের 'ধারি' প্রস্তুত করিয়া বাল্লার বাজারে আনিয়া যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন উল্লেখযোগ্য শিল্পজাত দ্রব্য অন্য স্থানে বেশী পরিমাণে রপ্তানি হয় না। পার্বত্য প্রজাদের ঘরে ঘরেই তাঁত ও চরকা আছে বটে কিন্তু তাহারা অল্পমূল্যে বিলাতী বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে ও বিলাসিতা শিক্ষা করিতে অভ্যস্ত হওয়ায় চরকার প্রচলন কমিয়া আসিতেছে। কৃষি ও বনজাত কাঁচা মাল ভিন্ন প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসই ব্রিটিশ এলাকা হইতে আমদানি হইয়া থাকে।

এই বিভাগে বাল্লার বাজার ও হাটই প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান। তিল, কার্পাস, রুই তহশীল কাছারীর ঘাটে এবং ছন, বাশ, গাছ ইত্যাদি বনজ দ্রব্য বনকর ঘাটে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। অগ্রিম দাদনে ঐ সকল মাল খরিদ বিক্রয়ের নিয়মও প্রচলিত আছে। কৈলাসহর ও ধর্মনগর বিভাগের ন্যায় এই বিভাগের 'রোক' বা গাছ টানিবার কার্য হাতী দ্বারা করান হইয়া থাকে। করাত দ্বারা কাঠ চিরাইবার কোন কারখানা এই বিভাগে নাই। অধুনা টীনের ঘর ইত্যাদি প্রস্তুত করার উপলক্ষে করাত দ্বারা কেহ কেহ গাছ চিরাইয়া লইতেছে কিন্তু করাতের পারমিট প্রথা ব্যয়সাধ্য হওয়ায় করাতিগণ পারমিট ক্রয় করিয়া কার্য করিতে অসুবিধা বোধ করিয়া থাকে। স্থানীয় উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই প্রকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কঠোরতা দূর করতঃ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দেওয়া সম্পর্কে রাজকর্মচারীদিগের সর্বদা বিশেষ লক্ষ্য থাকা আবশ্যক।

১৩২০ ত্রিং সনে খোয়াই বাজারের (বাল্লার বাজারের) উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে বাৎসরিক মেলার স্থানেরও বিশেষরূপ উন্নতি সাধন করা হইয়াছিল। পূর্বে বিভাগীয় আফিসগৃহের চারিদিকেই বাৎসরিক মেলা বসিত ; এজন্য স্থানাভাববশতঃ লোকের অত্যন্ত অসুবিধা হইত এবং ব্যবসায়িগণ দোকানের স্থান পাইতে অসুবিধা ভোগ করিত। ১৩২০ সনে মেলা ও প্রদর্শনীর জন্য খোয়াই নদীর তীরস্থিত বহু জঙ্গলাকীর্ণ বিস্তীর্ণ স্থান আবাদ করাইয়া এই স্থান বাৎসরিক মেলার জন্য মনোনীত করা হইয়াছিল এবং যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতে পারে তাহার বিহিত করা হইয়াছিল।

কার্পাস ও রুই বেতের খাচিতে পূর্ণ করিয়া রপ্তানি করার নিয়ম বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত আছে। এই সকল খাচি প্রতি ৫ এক পয়সা করিয়া ফিস সরকারের আদায় হয় এবং ইহাকে 'ফাইল ফিস' বলে। এই ফাইল ফিস বাবত সরকারের অনেক টাকা প্রতি বৎসর জমা হইয়া আসিতেছে। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সহিত বহু লিখাপড়া করিয়া এই ফাইল ফিসের টাকা ও আবশ্যকীয় সরকারী সাহায্য দ্বারা ১৩২০ ত্রিং সনে খোয়াই নদীর তীরে তহশীল কাছারীর পার্শ্বে টীনের গোদাম প্রস্তুতের অনুষ্ঠান চলিতেছিল। তৎপরবর্তী ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সময়ে উক্ত প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইয়াছিল। কল্যাণপুর তহশীল কাছারীর সন্নিকটে খোয়াই নদীর তীরে একটি, চেবরী নামক স্থানে একটি এবং আশারামবাড়ী তহশীল এলাকায় বনগ্রাম মৌজায় একটি, এই তিনটি বাজার ১৩২০ ত্রিং

সনে নূতন স্থাপিত হইয়াছিল। বনগ্রাম মৌজার বাজারটি পূর্বেও একবার স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সিন্দুরখাল প্রভৃতি চা-বাগানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইহার অস্তিত্ব অল্পকাল মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

রেমাছড়া চা-বাগানের ম্যানেজার মিঃ স্প্রুল সাহেব এবং তাঁহার এ্যাসিস্ট্যান্ট সাহেব ও অধীনস্থ কর্মচারিগণ ১৩২০ ত্রিং সনের বার্ষিক মেলা ও প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া স্থানীয় সকলের সহিত বিশেষরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পূর্বে এই অঞ্চলে তিল, কার্পাস ইত্যাদি পুরাতন প্রথামতে তুলাদণ্ডের সাহায্যে পরিমাপ হইত। বাটখারার প্রচলন ছিল না। তুলাদণ্ডের প্রান্তভাগে দাগ কাটা থাকিত, তাহা দ্বারা জিনিসের ওজন ঠিক করা হইত এবং ১০০ ও ১২০ তোলায় সের ধরিয়া স্থানীয় প্রথামতে পরিমাপ কার্য নির্বাহ হইত। বিভাগীয় আফিস স্থাপনাবধি ৮০ তোলায় সের ধরিয়া পাল্লি ও বাটখারার সাহায্যে পরিমাপ চলিয়া আসিতেছে। পার্বত্য প্রজার সম্প্রদায়ভেদে কোথাও আধমণ এবং কোথাও ত্রিশ সের হিসাবে ফাইল বা বাঁশ বেতের খাঁচি পূর্ণ কার্পাস পাহাড়ে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। ট্রেণে কলিকাতা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মাল চালান দেওয়ার সুবিধার নিমিত্ত Chittagong Company, Commercial Company, প্রভৃতি কার্পাস ব্যবসায়ীদিগের প্রার্থনা মতে খোয়াই টাউনস্থিত কার্পাস ঘাট হইতে কার্পাস ও রুই ছালার চট দ্বারা বস্তা বন্দী করিয়া পরিমাপক্রমে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা ১৩২০ ত্রিং সনে প্রচলিত করিয়া অনেক বিষয়ের সুবিধা করা হইয়াছিল।

তৎপূর্বে বাঁশের খাঁচিতে ঢক (পরিমাপ) ও পরতাল (পরীক্ষা) হওয়ার পর ব্রিটিশ এলাকায় মুচিকান্দি বাজারে নিয়া ঐরূপ বস্তাবন্দী করতঃ ব্যবসায়িগণ দ্বারা রুই, কার্পাস যথাস্থানে সায়েস্তাগঞ্জ ষ্টেশন হইতে ট্রেণে চালান হইত।

খোয়াই বিভাগে কার্পাস ব্যবসায়ী কোম্পানী ও বড় বড় ব্যবসায়িদিগের মাল আড়তদার ও তাহাদের অধীনস্থ 'ফড়িয়াদের' মারফৎ খরিদ হইয়া থাকে। যাহারা আড়তদার মারফত টাকা গ্রহণ করিয়া পাহাড়ে পার্বত্য প্রজাদের নিকট হইতে মাল খরিদ করিয়া আড়তদারকে বুঝাইয়া দেয় তাহাদিগকে স্থানীয় কথায় 'ফড়িয়া' বলে। ১৩২০ ত্রিং সনের ব্যবস্থামতে কোম্পানী বড় বড় ব্যবসায়ীদের কর্মচারী খোয়াই টাউনে উপস্থিত থাকিয়া মাল খরিদ করিয়া চালান দেওয়ায় উৎপন্নকারী প্রজাগণের পূর্বাপেক্ষা জিনিসের দর কতক অধিক পাওয়ার সুবিধা হইতেছিল। তদ্দরুন প্রবঞ্চনা কার্যাদিও অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিতেছিল। আড়তদারগণ কোম্পানীগুলি হইতে যে দেবতার বৃত্তি আদায় করিত তাহাও খোয়াই টাউনে প্রতিষ্ঠিত দেবতার বৃত্তিরূপে পরিগণিত হইয়া ব্যয়িত হইতেছিল। তৎপূর্বে এই বৃত্তির টাকা আড়তদারগণ আদায় করিয়া নিজস্বরূপে ব্যবহার করিত।

খোয়াই বিভাগে চাষ-আবাদকারী প্রজার সংখ্যাল্পতা ও অন্যান্য অসুবিধাবশতঃ জোত ও তালুকী ভূমির মূল্য সাধারণতঃই অল্প ছিল এবং কোন কোন সরকারী কর্মচারীর অদূরদর্শিতাবশতঃ অনুপযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে বহু পরিমাণ স্থান বন্দোবস্ত দেওয়ায় আবাদ অনুষ্ঠান কার্য শিথিলভাবে চলিতেছিল। ১৩২০।১৩২১ ত্রিং সনে ঐ প্রথার পরিবর্তন হওয়ায় এবং নিকটবর্তী ব্রিটিশ এলাকায় চাষী প্রজাদের জমির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় জমির মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্থানীয় শ্রমজীবির সংখ্যা কার্যের পরিমাণের তুলনায় কম থাকায় কাছাড় অঞ্চল হইতে কামলা আনাইয়া বড় বড় কারবারিগণ তাহাদের দ্বারা পাহাড় হইতে রোক বা গাছ কাটাইয়া রপ্তানী করিয়া থাকে। সাধারণ শ্রমজীবিগণ দৈনিক ।৶০ আনা হইতে ৸০ আনা এবং সময় সময় ১৲ এক টাকা পর্যন্ত উপার্জন করিয়া থাকে। খোয়াই নদী পথে ব্রিটিশ এলাকা হইতে তৈল, লবণ, ডাইল ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য খোয়াই অঞ্চলে আমদানি করাও কষ্টসাধ্য হওয়ায় ঐ সকলের বাজার দর ব্রিটিশ এলাকার দর হইতে সর্বদাই অধিক থাকে। বিলাতী কাপড় সস্তা ও সুন্দর মনে করিয়া সাধারণতঃ লোকে তাহা অধিকতর পছন্দ করে। স্বদেশী আন্দোলন জনিত জাতীয়তার প্রতি লোকের কোন আকর্ষণ দেখা যায় না।

কুটির-শিল্প ও হস্তনির্মিত দ্রব্যাদি পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে কিছু কিছু দেখা যায়। তাঁত ও চরকায় সূতা কাটা প্রভৃতি শিল্প ক্রমশঃ বিলুপ্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। খোয়াই বিভাগে কুম্ভকার শ্রেণীর লোক মোটেই নাই। হাঁড়ি, পাতিল ব্রিটিশ এলাকা হইতে উচ্চ মূল্যে খরিদ করিয়া আনিতে হয়। বাৎসরিক মেলার সময় ব্রিটিশ এলাকার ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে স্থানীয় লোক কাঁসা ও পিতলের দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া থাকে।

এই বিভাগের পর্বত ও সমতল ভূমির প্রায় সমস্ত প্রজাই ঋণজালে জড়িত। কোন বড় লগ্নী ব্যবসায়ী মহাজন ও ব্যাঙ্ক না থাকায় এবং সমবায় সমিতিরও কুত্রাপি অস্তিত্ব না থাকায় সুদের হার অত্যধিক। শতকরা মাসিক ৪৲ টাকা হইতে ১২॥০ টাকা পর্যন্ত সুদের হার প্রচলিত আছে। সরকারী তাগাবী ব্যাঙ্কের কার্য বন্ধ হওয়ায় কুসিদ নিয়ামক বিধি দ্বারাও প্রকৃত পক্ষে বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয় না।

খোয়াই বিভাগের বনরাজি রাজ সরকারের ও প্রজা সাধারণের বিশেষ মূল্যবান সম্পত্তি। তিল, কার্পাস, রুই ও বনজ দ্রব্যের মাশুল বাবত আয়ই খোয়াই বিভাগের প্রধান আয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বন বিভাগের ধ্বংস সম্পর্কে যেরূপ অনুষ্ঠান চলিতেছে তাহা রক্ষা ও উন্নতির বিষয় সেরূপ চেষ্টা চলিতেছে না। ব্রিটিশের বনবিভাগের অনুকরণে মাশুল ধার্যকরণাদি বিষয়ে কোন কোন নিয়ম প্রবর্তিত হইতেছে বটে কিন্তু কোন বিষয়ের অন্ধ অনুকরণ দ্বারা প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। বনবিভাগ ও তিল, কার্পাসের উন্নতি বিধান দ্বারা বহু উপায়ে রাজা-প্রজার আর্থিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে কিন্তু দুঃখের বিষয় তৎপ্রতি যথোচিত মনোযোগ না দিয়া অনেকেই খনি আবিষ্কারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত দেখা যায়। খনি আবিষ্কার অপেক্ষা কৃষি ও বনবিভাগের উন্নতি সহজসাধ্য এবং অধিকতর লাভজনক বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ সুস্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গমনাগমনের পথ

আসাম-বেঙ্গল রেল-রাস্তার সায়েস্তাগঞ্জ ষ্টেশন হইতে আসামপাড়া হইয়া আম্ বা ঘনশ্যামপুর চা-বাগান পর্যন্ত হবিগঞ্জ লোক্যাল বোর্ডের ২৪।২৫ মাইল ভাল রাস্তা বা সড়ক আছে। চুণারঘাটের ডাক বাঙ্গলা, রাজার বাজার প্রভৃতি এই রাস্তার পার্শ্বেই অবস্থিত। আসামপাড়া ও রাজার বাজার নামক স্থানে রাজ সরকারী জমিদারী বিভাগের দুইটি তহশীল কাছারী আছে। আসামপাড়া হইতে খোয়াই টাউন প্রায় দেড় মাইল ব্যবধানে; ১৩২০ ত্রিং সনে এই দেড় মাইল ব্যাপী সড়কে কয়েকটি কাঠের সেতু নির্মাণ করাইয়া ও মাটি ফেলিয়া উচ্চ করতঃ সংস্কার করা হইয়াছিল।

তৎপূর্বে খোয়াই বিভাগের ভূতপূর্ব ভারপ্রাপ্ত কাযকারক বাবু বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সময়ে খোয়াই টাউন হইতে আসামপাড়া পর্যন্ত এই রাস্তা এবং খোয়াই টাউন হইতে মেলকা বাড়ী আবকারী দোকান পর্যন্ত একটি সাধারণ রাস্তা নির্মিত হইয়াছিল। সায়েস্তাগঞ্জ হইতে খোয়াই টাউনের দূরত্ব ১৮।১৯ মাইল হইবে। খোয়াই নদীর পাড়েই খোয়াই টাউন অবস্থিত। গোদারা নৌকায় নদী অতিক্রম করিতে হয়। ১৩৩৮ ত্রিং সনে সায়েস্তাগঞ্জ ষ্টেশন হইতে খোয়াই নদীর তীরবর্তী বাল্লাঘাট পর্যন্ত আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের একটি ব্রাঞ্চ লাইন নির্মিত হইয়াছে; সত্বরই এই লাইনে গাড়ী চলিতে আরম্ভ হইবে। ইহা দ্বারা খোয়াই টাউনের সহিত সায়েস্তাগঞ্জ ষ্টেশনের সংযোগ সাধিত হওয়ায় লোক চলাচল ও মালের আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে খোয়াই বিভাগের অনেক প্রকারের উন্নতি সাধিত হইবে।

১৩১৯-১৩২০ ত্রিং সনে মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য বাহাদুর শিকার উপলক্ষে রাজধানী আগরতলা হইতে পাহাড়ের পথে কল্যাণপুরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আগরতলা সদর বিভাগের অন্তর্গত বীরেন্দ্রনগর হইতে কল্যাণপুর পর্যন্ত পার্বত্য রাস্তার জঙ্গল পরিষ্কার ও সংস্কার করাইয়া তৎসময়ে হস্তী ও বোঝাসহ লোক চলাচলের বিশেষ সুবিধা করাইয়া লওয়া হইয়াছিল। সায়েস্তাগঞ্জ ষ্টেশন হইতে খোয়াই টাউন ও কল্যাণপুর হইয়া বীরেন্দ্রনগরে ও আগরতলা রাজধানীর সহিত একটি ভাল রাস্তা দ্বারা সংযোগ সাধিত হওয়া স্বর্গীয় মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের বিশেষ অভিপ্রেত ছিল।

খোয়াই টাউন হইতে কল্যাণপুর পর্যন্ত ১১।১২ মাইলব্যাপী একটি রাস্তা এবং কল্যাণপুর হইতে খোয়াই নদীর দক্ষিণ পাড় দিয়া আসামপাড়া পর্যন্ত পুরাতন সড়কের যে চিহ্ন স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে ঐ প্রশস্ত অপর রাস্তাটি সত্বর প্রস্তুত করাইবার অভিপ্রায়ে স্বর্গীয় মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের আদেশ অনুসারে ১৩২০-১৩২১ ত্রিপুরাব্দে খোয়াই বিভাগীয় আফিস হইতে রাজধানী আগরতলাস্থিত মন্ত্রী আফিসে প্ল্যান এষ্টিমেট প্রেরিত হইয়াছিল। খোয়াই টাউন হইতে কল্যাণপুর পর্যন্ত ১২ মাইল রাস্তার জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় বাঁশের সেতু ঐ সময়ে নির্মাণ করাইয়া লোক যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আলেপছা নামক স্থানে খোয়াই নদী এই রাস্তায় অতিক্রম করিতে হইত। রামচন্দ্র ঘাট দিয়া খোয়াই নদী অতিক্রম করিয়া কল্যাণপুর যাওয়ার অপর একটি রাস্তাও সেই সময়েই প্রস্তুত করা হইয়াছিল। খোয়াই টাউন পর্যন্ত যাতায়াতের সড়ক নির্মাণ করাইবার জন্য স্বর্গীয় মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের এত আগ্রহ ছিল যে পরবর্তী বৎসর (১৩২১ ত্রিং সনে) তিনি সায়েস্তাগঞ্জ ষ্টেশন হইতে মোটর গাড়ীতে খোয়াই টাউন হইয়া কল্যাণপুর পর্যন্ত পৌঁছিয়া আঠারমুড়া ও বড়মুড়া পর্বতে শিকার করিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে কার্যকরী হওয়ার নিমিত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত

কার্যকারক প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তদীয় আদেশ সত্বরতার সহিত প্রতিপালনে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল।

খোয়াই টাউন হইতে শিবরামের বস্তীর পথে আশারাম তহশীল কাছারী পর্যন্ত একটি এবং রেমা চেকিং ঘাট পর্যন্ত একটি—এই দুইটি রাস্তার জরীপক্রমে প্ল্যান এষ্টিমেট এবং লালছড়ার উপর লৌহ সেতু নির্মাণের জন্য প্রস্তাবও ১৩২০/১৩২১ ত্রিং সনে প্রেরিত হইয়াছিল। সড়ক প্রস্তুত করাইবার কুলি-মজুর এই অঞ্চলে পাওয়া যায়; কাষ্ঠাদি উপকরণেরও অভাব নাই।

খোয়াই নদীপথেই সাধারণতঃ এই বিভাগের মালের আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহার তীরে হবিগঞ্জ সাব-ডিভিশন ও ব্রিটিশ এলাকার বড় বড় বাজার ও কারবারের বড় বড় স্থানগুলি অবস্থিত। এই নদীপথে বার মাসই যাতায়াত করা যায়। কল্যাণপুর হইতে ব্রহ্মছড়া পর্যন্ত নদী পথে বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে বড় নৌকায় যাতায়াত করিতে পারা যায় না; কিন্তু বাঁশের 'ভুর' ইত্যাদি ভাটি আনিতে এবং ছোট ছোট লং বা কোন্দা নৌকায় যাতায়াত করিতে বাধা হয় না। উদঙ্গ ও ঝালেঙ্গ প্রভৃতি বড় ছড়া দিয়া নৌকা চলে না। বাঁশ গাছ ইত্যাদি বনজ দ্রব্যাদি সাধারণত: এই সকল ছড়া পথেই রপ্তানি হয়।

বর্তমান খোয়াই বিভাগে খোয়াই টাউনে মাত্র একটি পোস্ট আফিস আছে। এখানে কোন টেলিগ্রাফ আফিস নাই। অদূর ভবিষ্যতে খোয়াই টাউনের একস্ট্রা ডিপার্টমেন্ট আফিসটিকে ডিপার্টমেন্টাল আফিস বা সাব- আফিসে পরিণত করিয়া কল্যাণপুরেও একটি পোস্ট আফিস স্থাপন করা প্রয়োজন হইবে। কল্যাণপুরে একটি সব-ডিভিশন স্থাপন করা কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত ছিল।

খোয়াই নদীপথে রপ্তানিকৃত তিল, কার্পাস রুই ও বনজ দ্রব্যের সরকারী মাশুল আদায় ইত্যাদি কার্য উপলক্ষে বর্তমান খোয়াই টাউনে সরকারী আফিস ও উচ্চ বেতনের বড় বড় কর্মচারী নিযুক্ত রাখার প্রয়োজন হইবে। এই সকল রপ্তানি শুল্কই খোয়াই বিভাগের প্রধান আয় বলিয়া কল্যাণপুরে নূতন আফিস স্থাপন অনাবশ্যকীয় ব্যয় বাহুল্যের বিষয় হইবে মর্মে ১৩২০ ত্রিং সনে বিভাগীয় আফিস হইতে প্রতিবাদ হইয়াছিল। কল্যাণপুরের উন্নতি বিধান এবং প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণই উক্ত সব-ডিভিশন স্থাপন সম্পর্কে মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কীর্তিমান পূর্বপুরুষের গৌরব রক্ষা করার কার্য পরবর্তী বংশধরদিগের মনে যে মহৎ ভাবের সঞ্চার করে, অন্যের পক্ষে তাহার ধারণা করা সহজ নয়।

খোয়াই নদীর বক্রগতির দরুন প্রতি বৎসর নদীর পাড ভাঙ্গিয়া স্রোতের পরিবর্তনের দরুন খোয়াই টাউন রক্ষা সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ দেখিয়া ভূতপূর্ব নায়েব-দেওয়ানবাবু কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় লালছড়ার মুখের সন্নিকটবর্তী স্থান হইতে কার্পাস ঘাটির উজান দিক পর্যন্ত একটি খাল কাটাইয়া খোয়াই নদীর গতি পরিবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ১৩২০ ত্রিং সনে বিভাগীয় আফিস হইতে এ সম্বন্ধে উক্ত স্কিমের মঞ্জুরী গ্রহণে কার্যারম্ভ হয়। ইহা দ্বারা খোয়াই টাউনের আয়তন বৃদ্ধি ও ভবিষ্যতে টাউনের অন্যান্য উন্নতি সাধনের বিশেষ সহায়তা হইবে আশা করা যায়।

সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

আঠারমুড়া ও বড়মুড়া পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী খোয়াই নদী এবং তাহাতে পতিত বড় বড় ছড়াগুলির উভয় পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমির মৃত্তিকা কৃষিকার্যের বিশেষ উপযোগী। প্রাকৃতিক নিয়মে পাহাড়ের সবুজ সার, পলিমাটি ও খনিজ পদার্থযুক্ত সার সমতল ভূমিতে সঞ্চিত হওয়ায় ঐ সকল ভূমির উর্বরতা শক্তি সহজে বিনষ্ট হওয়ার আশংকা নাই। অতি বৃষ্টির দরুন নদী ও ছড়াতে জল বৃদ্ধির সময় স্থানে স্থানে বাঁধ দ্বারা ফসল রক্ষার ব্যবস্থা হইলেই কৃষিকার্য ভালরূপে চলিতে পারে। এই সমতল ও অনুচ্চ টিলা ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ধান্য, পাট, সরিষা, তিল, কার্পাস ইত্যাদি ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। নানাবিধ ইক্ষু এবং তামাক, মরিচ প্রভৃতি তাহাতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল স্থান এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি চা-কৃষির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ব্রিটিশ এলাকায় এরূপস্থানে যথেষ্ট পরিমাণে চা উৎপন্ন হইতেছে এবং তদ্দ্বারা ব্যবসায়ীদিগের ও স্থানীয় লোকের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইতেছে। কল্যাণপুর অঞ্চলে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ চক্রবর্তীর সহিত যে বিস্তীর্ণ ভূমির কায়েমী তালুক বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে চা-বাগান করার এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কৃষিকার্য করার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। প্রফেসার বাবু সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু দুর্গামোহন রায়, বাবু আনন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেকে এই বিভাগে কায়েমী তালুকদারীর বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া কৃষিকার্যের উন্নতিবিধান করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ অকৃতকার্য হইয়া সংকল্পিত কার্য পরিত্যাগ করিয়াছেন কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধনও করিয়াছেন। উন্নত প্রণালীর চাষ-আবাদ, পর্যায়ক্রমে ফসল করার নিয়ম এবং সার প্রদান প্রভৃতি বিষয় সাধারণ কৃষকদিগের অপরিজ্ঞাত।

চা-গাছে অস্থি সার প্রভৃতি সার দেওয়ার নিয়ম সন্নিকটবর্তী আমু, রেমা বাগানে প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ গরু দ্বারা, কেহ কেহ মহিষ দ্বারা হাল চাষ করিয়া থাকে। একটি মাত্র মহিষ দ্বারা ছোট লাঙ্গলে জমি চাষ করার নিয়মও এই স্থানে প্রচলিত আছে। জমি নিড়াইয়া আগাছা পরিষ্কার করার নিয়ম পাট ফসল উপলক্ষ্যেই বেশী চলিতে দেখা যায়। খোয়াই বিভাগে উৎকৃষ্ট আনারস ও কলা পাওয়া যায়। শিবরামের বস্তী নামক মৌজা আনারসের জন্য প্রসিদ্ধ। জলচুপী, সিঙ্গাপুরী ও দেশী আনারসের চাষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বিভাগে ইক্ষু গুড়ও যথেষ্ট উৎপন্ন হইতেছে। সরকার হইতে উপযুক্তরূপে উৎসাহ দেওয়া হইলে ইহার আরও উন্নতি সহজেই হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কোন লাভজনক কৃষি দেখা গেলে কোন কোন সরকারী কর্মচারী শুল্ক বা ট্যাক্স স্থাপন করিয়া তাহা অঙ্কুরেই বিনাশ করার সংকীর্ণ ভাব অন্তরে পোষণ করিয়া থাকেন। অন্যায় মতে ট্যাক্স ধার্য হইলে ও তদ্দ্বারা প্রজা উৎপীড়িত হইলে মোটের উপর রাজার আয় বৃদ্ধি না হইয়া যে তাহা হ্রাসের কারণ উপজাত হয় তাহা অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। রাজা ও প্রজার স্বার্থে প্রকৃত পক্ষে মূলতঃ কোন প্রভেদ নাই।

পার্বত্য প্রজাগণ নিজেদের ব্যবহারের জন্য কেহ কেহ অল্প সংখ্যক শূকর পুষিয়া থাকে। ইহাদের অনেকে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি করিয়া শূকর ও মোরগ পোষণ ও মাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছে। ভেঁড়া ও ছাগল অতি অল্পই দেখা যায়। প্রতি মঙ্গলবারে বল্লার হাটে বহু টাকা মূল্যের হাঁস, কবুতর, পাঠা,

ডিম্ব, মোরগ ইত্যাদি ব্রিটিশ এলাকা হইতে আনীত হইয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। স্থানীয় লোক ঐ সকলের চাষ ও ব্যবসা করিলে যথেষ্ট লাভবান হইতে পারে—কিন্তু কেহই তাহা করিতেছেন না।

এই বিভাগে ফলের বাগান (Hoıticulture) সম্বন্ধে কাহারও কোন প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে না। এড়ি এবং রেশমের চাষ সম্পর্কে এই বিভাগে বিশেষরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কিন্তু কাশীপুর ফার্মের বিলোপ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের এতৎসম্পর্কিত সকল প্রচেষ্টাই অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছে। কৃষি বিভাগে উপযোগী ও উৎসাহী লোকর অভাবে কার্পাস কৃষিরও কোন উন্নতি হইতেছে না বরং ক্রমশঃ তাহা অবনতির পথেই অগ্রসর হইতেছে।

অষ্টম অধ্যায়

স্থান ও ব্যক্তিবিশেষ

শ্রীহট্ট জিলার হবিগঞ্জ সব-ডিভিশন্ কুমিল্লা জিলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সব-ডিভিশন এবং স্বাধীন ত্রিপুরার সদর ও খোয়াই বিভাগের মধ্যবর্তী স্থানান্তরিত অধিবাসিগণ সাধারণতঃ মোকদ্দমা বা কলহপ্রিয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। চা-বাগানের পলাতক কুলি, এরাজ্য হইতে মদ বিঝাড়া, তিল, কার্পাস বিঝাড়া, বনজ বস্তু চুরি ইত্যাদি সম্পর্কিত ঘটনা এ রাজ্যে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। হবিগঞ্জ সব-ডিভিশনের অফিসার মিঃ স্ট্রচী আই, সি, এস, ১৩২০ ত্রিং সনে খোয়াই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের সহিত আসামপাড়ায় একত্র মিলিত হইয়া এবং পত্র ব্যবহার দ্বারা এ রাজ্য ও ব্রিটিশ এলাকার প্রান্ত সীমায় সন্নিকটবর্তী স্থানে বসবাসকারী দুষ্ট লোকদিগকে উপযুক্তরূপ শাসনের জন্য একযোগে বিশেষ চেষ্টা করার ফলে কিছুকাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে বেশ শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। চা-বাগানের কুলি গ্রেপ্তার সম্পর্কিত ইন্দ্রনাগ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে ইউরোপীয় ম্যানেজার সাহেবদিগের সঙ্গে এ রাজ্যের কর্মচারীদের মনোমালিন্যজনিত বিষয়ে তৎসময়ে কর্তৃপক্ষের সহিত অনেক লিখাপড়া চলিতেছিল। ১৩২০-১৩২১ ত্রিং সনের চেষ্টায় উভয় পক্ষ মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব স্থাপিত হইয়াছিল। রেমা বাগানের অভিজ্ঞ বয়োঃবৃদ্ধ ও সম্মানিত ম্যানেজার মিঃ স্প্রুল সাহেব দ্বারা উক্তরূপ সদ্ভাব স্থাপনে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল।

খোয়াই বিভাগের গণকী মৌজায় প্রথমতঃ বিভাগীয় আফিস স্থাপনের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। চাকলা রোসনাবাদের অন্তর্গত পং নুরনগর সাং বিটঘর নিবাসী বাবু গঙ্গাচরণ রায় নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ঐ স্থানে কতক ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া স্থানের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নূতন আফিস স্থাপন করিতে হইলে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে বিবেচনায় ইজারাদার কৈছির মহাম্মদ চৌধুরীর কাছারীতেই বিভাগীয় আফিসের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বাবু বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিভাগীয় টীনের ঘর প্রথম নির্মাণ করিয়াছিলেন। তৎপর ১৩২০ ও ১৩২১ ত্রিং সনে ঐ ঘরের আয়তন বৃদ্ধি ও আফিসাদি সম্পর্কে নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৩২০ ত্রিং সনে খোয়াই টাউনে হরি মন্দির স্থাপন, টাউন হল নির্মাণ প্রভৃতি স্থানীয় উন্নতিজনক কায হইয়াছিল। ঐ সময়ে বর্তমান টাউনের আয়তনও বর্ধিত হইয়াছিল এবং এতদুপলক্ষে চতুষ্পার্শ্বের প্রয়োজনীয় স্থানগুলি রীতিমত খাস করা হইয়াছিল।

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ও মাননীয় জজ বাবু দ্বারকা নাথ চক্রবর্তী, ঢাকা জজ কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু আনন্দচন্দ্র রায়, রাজসাহী কলেজের প্রফেসার বাবু সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু গয়াপ্রসাদ চক্রবর্তী, এ রাজ্যের বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক বাবু দুর্গামোহন রায়, উকীল বাবু রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাবু নবকুমার চক্রবর্তী, বাবু মহেন্দ্রচন্দ্র সেন, বাবু অতুলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মুনসী ইসমাইল, বাবু বিপিনচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ খোয়াই বিভাগে ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়া নানাবিধ উন্নতিজনক কাযে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্তীই সর্বাগ্রগণ্য বিবেচিত হইতে পারেন। শ্রীযুত গয়াপ্রসাদ চক্রবর্তী মহাশয় অধিকাংশ সময় খোয়াই বিভাগেই অবস্থান করিয়া থাকেন। তিনি সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। খোয়াই বিভাগের উন্নতিজনক প্রায় সমস্ত কার্যেই তাঁহাকে অগ্রণী দেখা যায়।

পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কান্তিয়া কবরা এবং শ্রীযুত গঙ্গাজয় বিয়াং চৌধুরী প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আধিপত্য করিতেছেন। পার্বত্য রীতি অনুসারে পাড়ায় পাড়ায় এবং দফায় দফায় চৌধুরী ও সর্দার নিযুক্ত হইয়া থাকে, তাহারাই সামাজিক শৃঙ্খলা যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। আধুনিক আইন আদালত দ্বারা পার্বত্য প্রদেশ সুশাসিত এবং সুরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। এই অবস্থায় পাবত্য প্রজাদের সামাজিক রীতি-নীতিগুলির সংস্কার ও উন্নতি বিধান সম্পর্কে সরকার পক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরিশিষ্ট—১

খোয়াই বিভাগ

খোয়াই তহশীল কাছারী

(১৩৩৭ ত্রিং সনের স্থিত বকেয়া বাকীর লিস্ট মতে লিখা হইল)

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ	হাল দাবী পথকর সহ	বকেয়া বাকী পথকর সহ	মোট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বেলছড়া	১৫৯॥৮৷//	১৪৮২৶৭	১৩১॥৵৬	৩০৩১৷৴৯	
২	রামচন্দ্রঘাট	২৮৭৷৻৷/৫	২৬৪০৷৯	৩৬৮১৷৴৯	৬৩২২॥৵৬	
৩	গঙ্গরমুড়া	৫০॥/১৬	৩৭৫৷/৫	৫৫০৷৶৬	৮৯৭৷৬	
৪	চাম্পাছড়া	১৪৬৸১৬৷	১৫০৪/৬	[illegible]	৩৪৮৪/৬	
৫	বগাবিল	৩০৻৯	৩০০॥৯	৩৩৩॥৩	৬৩৪/	
৬	সিঙ্গিছড়া	২৩৯৻১০॥	২৩৭৭৶	২১৪২৵৬	৪৫১৯৷/৬	
৭	বাছাইবাড়ী	১৪৩৸/২৷//	১৫৩১৷/	১০৭২৷৵৬	২৬০৪৶৬	
৮	গণকী	২২৩॥১১৷/১২॥	২৬৮৬৸৶৩	৪০৫৭৷৶৬	৬৭৪৪৸৵৯	
৯	চেবরী	৬৬৸৵১১//১২॥	৫১০৷৶৬	১৫৪১॥৬	২০৫২৲	
১০	গৌরনগর	৬৫/১৫৷	৬৮৯৸/৩	৯১৯৭৻৯	১৮৮৬৸৵	
১১	দেউনিয়া টীলা	২৮॥/১৮৷৫	৩৫৪৷/৩	৬৭৯॥৶৬	১০৩৪৻৯	
১২	মহিষমারা	১৯৻১০৷	২০৯॥৩	২২৮৷৶	৪৩৭৸৶৩	
১৩	ধনাবিল	২৫॥১৬৸	৩০১৲	২০১৷০	৫০২৷০	

খোয়াই বিভাগ

খোয়াই তহশীল কাছারী

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ	হাল দাবী পথকর সহ	বকেয়া বাকী পথকর সহ	মোট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৪	পদ্মবিল	১৮৩৷৶৯/	১৭৬৮৸৬	১৬৮২৻৬	৩৪৫০৸/	
১৫	মহারাজগঞ্জ বাজার	৷৷৬৸//১৮৸	১৯৬/৯	৩৪৷	২৩০৷/৯	
১৬	দুর্গানগর	৩৯৶১৫	৪৮০৸/৬	৪৩১/৩	৯১১৸৵৯	
১৭	খোয়াই	৯৷৶১৮৸	২০৯৷৷৶৯	২৯৸৶৯	২২৩৷৷৶৬	
১৮	সোনাতলা	১০৬৸১৩৷৷	১২৬৭৶/৬	২২০০৷৶৩	৩৪৬৭৷৷/৯	
১৯	খেংরাবাড়ী	৯৷/৬৷	৮৩৷৷৶৬	২৬৩৶৬	৩৪৬৸৶	
২০	রাজনগর	৭৬৸৶৬৩৷	৬৬২৷/৬	২১০৪৸৶৯	২৭৩৭৷/৩	
২১	প্রমোদনগর	৩৬৷/১৩৸	২৫৯৶/৬	৮৭০৻৬	১১২৯৶	
২২	রতনপুর	৩৫৷৷৶৩/১৭৷৷	৩৩১৷৶৯	১৪৭৮৷৷৶৯	১৮১০৶৬	
	মোট	১১৮৪৷৶৩৸১৷	২০১৬৪৸৶	২৮৩৬২৷৬	৪৮৪৭৭৷৶/৬	

পরিশিষ্ট—২

খোয়াই বিভাগ

কল্যাণপুর তহশীল কাছারী

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জমির পরিমাণ	হাল দাবি পথকর সহ	বকয়া বাকী পথকর সহ	মোট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কল্যাণপুর	৮৭৸৶১০	৬০৬৶৯	২১৮৭৻৬	২৭৯৩।৩	
২	খাস কল্যাণপুর	৩৭৸৵১৪/১৫	৫৫৮৷৷৶৬	৭৯৯।/৯	১৩৫৮/৩	
৩	কমলনগর	৩৩৸৵১৷৷	১৮৮৵৩	৩৮০৸/৯	৫৬৯৲	
৪	মহারাণীপুর	৪৪/	৩২৫৲	৬৪৪৸৵৩	৯৬৯৸৵৩	
৫	শান্তিনগর	১০৮৷৷/১০।	৬৬১৵৯	৮৪০।৵৩	১৫০১৷৷/	
৬	কল্যাণপুব বাজার	।/১৪৻৻২৷৷	১২৫৸/৯	৩৯৭৲	৫২২৸/৯	
৭	কৃষ্ণপুর	১২৫৸৵১০৸	৯২৭।৵	১৮০৫৻৩	২৭৩২।৵৩	
৮	ব্রহ্মছড়া	১৭৷৷	৪৬৶৬	৬১।৵৯	১০৭৷৷৵৩	
৯	আনেপছা	২২।৵১০	১২৪৸৶৯	১২৯/৯	২৫৪/৬	
১০	ঘিলাতলী	১২৮৸১৪।//১৫	৪৭৯৷৷/৬	৭৮০৷৷৵	১২৬০৶৬	
১১	প্রমোদনগর	৸০	৩৶	৬।৵	৯৷৷/	
১২	পুলিনপুর	৯৬৵	১৯৯।/৯	৮১৷৷৶৩	২৮১/	
১৩	গকুলপুর	৩৬৷৷৶	১০৮।৵	৫৭।৶	১৬৫৸	
	মোট	৭৪০৸৶৫/১২৷৷	৪৩৫৪৶৬	৮১৭১৵৬	১২৫২৫।৵	

খোয়াই বিভাগ

আশারামবাড়ী তহশীল কাছারী

বন বাজার	২৩২॥৶৯১//	২০২৬৷৵	১৬৫৯৲	৩৬৮৫৷৶
করাদি ছড়া	২১৮/১৩	১৯৫৯৷৷	৩২১॥৶৩	২২৮১৶৩
মোট	৪৫০৸/১১//	৩৯৮৫৸৶	১৯৮০॥৶৩	৫৯৬৬॥৩
খোয়াই তহশীলের				
মোট	১৯৮৪৷৶৩৸৻১৷	২০১৬৪৸৶	২৮৩১২৷৬	৪৮৪৭৭৷৵৬
খোয়াই বিভাগের				
সকল তহশীলের				
খাস জমির				
মোট	৩১৭৬৶১৩৸ ধুর	২৮৫০৪৸৶৬	৩৮৪৬৪/৩	৬৬৯৬৯৻৯

পরিশিষ্ট—৩

খোয়াই বিভাগ

আশারামবাড়ী তহশীল কাছারী

১	বন বাজার	২৩২॥৶৯১//	২০২৬৷৶	১৬৫৯৲	৩৬৮৫৷৶
২	কয়রাজি ছড়া	২১৮/১৩	১৯৫৸৷	৩২১॥৶৩	২২৮১৶৩
	মোট	৪৫০৸/১১//	৩৯৮৫৸৶	১৯৮০॥৶৩	৫৯৬৬॥৩
	খোয়াই তহশীলের মোট	১৯৮৪৷৶৩৸৫১৷	২০১৬৪৸৶	২৮৩১২৷৬	৪৮৪৭৭৷৵৬
	খোয়াই বিভাগের সকল তহশীলের খাস জমির মোট	৩১৭৬৶১৩৸ ধুর	২৮৫০৪৸৶৬	৩৮৪৬৪/৩	৬৬৯৬৯৲৯